অব্যক্ত

উম্মে মুসলিমা

ইদানিং রোজই দুপুরে ছেলের হাতে দোকানে ভাত-তরকারি পাঠাতে জামেলার দেরী হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি কোরবান আলীর তীব্র আকর্ষণ তার উপর জামেলার হাতের কচু-বেগুন-চিংড়ির ঘন্ট আর সরিষা বাটায় সজনের ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে গরম ভাঁপওঠা ভাত খাওয়ার জন্যে সে প্রায় মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করে। তখন খদ্দেরের সাথে দরাদরি করতে তার একটুও ভালো লাগে না। অন্যসময় দাঁড়িপাল্লায় মাপের কাঁটায় চোখ না রেখেও ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পাল্লা থেকে সুরসুর করে বাড়তি চাল বা ডাল সরিয়ে সঠিক মাপে জিনিষপত্র বেঁচতে কোরবানের জুড়ি নেই। সৎ দোকানদার বলে কোরবানের সুনামও আছে। কেবল চেহারাটাই ওর তেমন সুবিধের নয়। তাতে কী? পুরুষমানুষের কামাই-উপার্জনই হলো গিয়ে সৌন্দর্য। আর সে কারণেই তো জামেলার মতো সুন্দরী বউ তার কপালে জুটেছে। তবুও রোজ রাতে দোকান বন্ধ করে নিজের ব্যবহারের জন্য তারই দোকানের একটা তিব্বত স্নোর কৌটো থেকে এক খাবলা স্নো তুলে নিয়ে মুখে ঘষতে ঘষতে বাড়ির পথে পা বাড়ায় সে। চাঁদের বামে চাঁদ না হতে পারুক ঘোর অমাবস্যা হওয়া থেকে একটু বাঁচোয়া - এই আর কি।

ছেলের স্কুল ছুটির দিনে ছেলেকে দুপুরের পর থেকে দোকানে বসিয়ে একটু আধটু কাজ শেখাতে চেষ্টা করে কোরবান। বাকি দিনগুলোতে সে একহাতেই সব সামলায়। তার ইচ্ছে ছেলে শিক্ষিত হয়ে ঢাকা শহরে চাকরি করবে। মাসে মাসে তার নামে মনিঅর্ডারে টাকা আসবে। লোকে বলবে -
'কি কুরবান আলী, ছেলে তো তোমার দালান তুলে দেবে দেখছি'
কোরবান বলবে-'লেখাপড়া শিখাইছি, দোকানদারের ছেলেকে দোকানদার বানাইনি। যদি আল্লা দেয়----'
মেয়েকেও স্কুলে দিয়েছিল কোরবান আলী। কিন্তু ওড়না পরার অবস্থা এসে গেলে ক্লাস সেভেনের পরীক্ষার আগেই স্কুল বন্ধ করে দেয় সে। জামেলা কান্নাকাটি করেছিল -
'মেয়েটাকে ম্যাট্রিক পাশ করানোর কতো শখ ছিল আমার'
'ক্যান, ম্যাট্রিক পাশ করলে কি জজ-ব্যারিস্টারের সাথে বিয়ে হবে তোমার মেয়ের?'
জামেলা স্বামীকে গুছিয়ে বোঝাতে পারবে না জেনে চুপ করে যায়। কিন্তু মনে মনে ঠিক মেলাতে পারে। মেয়েকে শিক্ষিত করলে মেয়ে ভালোমন্দ বুঝতে শিখবে। ইসকুলে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। শহরে কতো ধরনের সরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল। ম্যাট্রিক পাশ না করলে সেসব প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ হবে না। কেবল ভালো একটা বিয়ে হলেই কি আর সবকিছু হয়? আল্লা না করুন যদি কোন কারণে মেয়েটা তার বিধবা হয়ে যায়, কিংবা স্বামী তালাক দেয় বা স্বামী পঙ্গু হয়ে যায় তাহলে তাকে করে খেতে হবে না? জামেলা মনে মনে গুছিয়ে রাখে কথাগুলো স্বামীকে বলবে বলে কিন্তু বলার সময় -
'সংসারে শিক্ষিত মেয়ের অনেক দাম' -বলে আর এগোতে পারে না। কোরবান আলী হেসে ফেলে -
'তোমাকে কি দাম দেই না আমি? তোমার হাতের রান্না না খেতে পারলে আমার ক্ষিদে মরে না। তোমার কোলের মধ্যে না শুলে আমার ঘুম হয় না, তোমার চিকন চোখের চাউনি দেখার জন্যে দোকানে বসেও আমার প্রাণ আঁইঢাঁই করে। তবে মেয়েদের আরবি শিক্ষা না দিতে পারলে বাপ-মায়ের দোজখেও জায়গা হবে না। তোমার বাপে তোমাকে ছিপারা পর্যন্ত শিখায়ে বিয়ে দিয়েছিল। আমার মেয়ে কুরান এক খতম দেবার পর বিয়ের ব্যবস্থা করবো। আর মেয়ে তো আমার তার মায়ের মতোই রুপসী। মাট্রিক পর্যন্ত এ মেয়ে ঘরে রাখতে পারবা?'

মেয়েকে স্কুল ছাড়ানোর কদিন পর থেকেই বাড়িতে মাদ্রাসার এক মওলানা নিযুক্ত করলো কোরবান। মেয়ে ওর মায়ের কাছ থেকেই কায়দা পড়া শিখেছে। তবে ছহি করে আরবি শেখার জন্যে মাদ্রাসার মওলানার কোন

বিকল্প নেই। কিন্তু যেদিন থেকে মওলানা বাড়িতে আসছে সেদিন থেকেই ছেলের হাতে দুপুরের ভাত পাঠাতে জামেলা দেরী করছে। তার ক্লাস থ্রি পড়ুয়া ছেলে গভীর উৎসাহ নিয়ে বাপের ভাত নিয়ে আসে বাজারে তার মুদির দোকানে। এ দায়িত্ব তাকে যেন এক পরিণত যুবকে পর্যবসিত করেছে। সে বড়দের মতো হাতে ঝুলিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে যাওয়ারই পক্ষপাতি। কিন্তু কিছুদুর গিয়ে তার কচি হাত ভারি টিফিন ক্যারিয়ার টেনে নিতে পারে না। তখন সে তা ঘাড়ে তুলে নেয়। তবে দোকানের কাছাকাছি পৌঁছেই আবার হাতে ঝুলিয়েই দোকানে ঢোকে। দোকানের সামনের রাজ্যের মানুষ তাকে যদি নাবালক ভাবে? ছেলে ভাতের ক্যারিয়ার চৌকির উপর রাখতে না রাখতেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেয় কোরবান। টিফিন বাটির বাইরে ছলকে পড়া তেল-ঝোলের রেখা আঙুলে পুঁছে তা জিবে চেটে নিয়ে সাবধানে একে একে বাটি নামায়। ছেলে কোন অনুমতি না নিয়েই একটা লাল ও একটা সবুজ রঙের লেবেনচুষ কৌটো খুলে নিয়ে চটাস চটাস করে চুষতে চুষতে বাপের লাল খেরো খাতা খুলে বসে। ভোজনরত বাপকে তার পৃথিবীর সেরা সুখী মানুষ বলে মনে হয়।

'আইজকাল ভাত আনতে দেরী হয় কেনরে বাপ?'-বলে কোরবান পাঁচ আঙুল একটা একটা করে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে মাখানো ভাত তরকারির এঁটো চেটেপুটে পরিস্কার করে খেয়ে আবার শব্দ তুলে ভাত মাখায়। ছেলেকে ছোট্ট এক লকমা এগিয়ে দিলে ছেলে জিব বের করে জিবের উপর লেবেনচুষ দেখিয়ে দেয়। সে স্কুল থেকে এসে গোসল করে ভাত খেয়ে বাপের জন্যে ভাত নিয়ে আসে। তার ক্ষিদে নেই। সে বলে -

'মা একশোবার একবার হেঁশেল একবার ঘর করলে দেরী হবে না?'

সন্ধ্যের পর দোকানপাট বন্ধ করে কোরবান যখন বাড়ি পৌছে তখন কুপি জ্বালিয়ে জামেলা বানু ভাত তরকারি সামনে নিয়ে বসে থাকে। দুপুরের মতো রাতে কিন্তু খাবার তৈরীতে সে দেরী করে না। ছেলেমেয়ে গপাগপ খেয়ে উঠে যায় আর কোরবান আয়েশ করে বাঁম হাত লিঙ্গস্থলে গুঁজে দিয়ে অল্প অল্প করে হলুদ ঝোলে শরীর দুলিয়ে ভাত মাখায় আর খায়। জামেলাকেও খেতে বলে কিন্তু জামেলা স্বামীর খাওয়া দেখতে বড় ভালোবাসে। স্বামী যখন খাওয়া শেষে ভাতের থালার উপর তর্জনী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেঁছে পুঁছে থালা একেবারে ফকফকা করে দেয় তখন জামেলার মনে হয় সে পৃথিবীর সবচে সুখী স্ত্রী। সেদিনও মসৃণ পিঁড়িতে সুডৌল পাছা ঠেকিয়ে জামেলা দুহাতে সমকোণ তৈরি করে গালে হাত দিয়ে স্বামীর খাওয়া দেখছিল। কোরবান দুবার জিজ্ঞাসা করে -

'বেগুন-বড়ির তরকারি আজ মাখো-মাখো না করে ঝোল-ঝোল করেছ কেন? নুনও কম'। কোন উত্তর না পেয়ে কোরবান বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বউ তার ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু অন্যমনা।

'দুপুর বেলাও আজকাল দেরী করে ভাত পাঠাচ্ছ। হয়েছে কী তোমার?' সম্বিত ফিরে জামেলা নুনের বাটি এগিয়ে দেয়। বলে-

'মেয়েটা আগে একটু হাতের কাজে লাগতো। এখন দুপুরে ওস্তাদজির কাছে পড়তে বসে বলে সবকাজ একহাতে করতে গিয়ে বেলা বেড়ে যায়।'

যুক্তি জোরালো নয়। ওস্তাদজি সাড়ে বারোটায় আসে। আগে মেয়ে স্কুল থেকে আসতো তারও পরে। কবে আবার মেয়ে তার রান্নার কাজে সহযোগিতা করেছে? স্বামী যাতে ও প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাই তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় জামেলা -

'কাল কিন্তু ছেলের হাতে ঘানিভাঙা সর্ষের তেল পাঠাবা একছটাক। ভর্তা মাখানো তেল নেই বাড়িতে'। কিন্তু রান্নায় বউয়ের অমনোযোগ কোরবানকে রীতিমত বিস্মিত করে। যার খাওয়ার কথা চিন্তা করে জামেলা বাপের বাড়ি পর্যন্ত বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে তার কী এমন কাজ বেড়েছে যে সে অখাদ্য রান্না করে রাখবে? সুন্দরী বউ নিয়ে সে কি কিছুটা সন্দিহান? ওস্তাদজি কেমন মানুষ? ছি! ছি! ওস্তাদজির সম্মন্ধে বাজে ধারণা করলে তো তার মহাপাপ হবে। বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়া বউয়ের পেলব নিতম্বে হাত বুলাতে বুলাতে একটু খামচে ধরে কিছু একটা ইঙ্গিত দিলেও বউয়ের কোন সাড়া পেল না কোরবান। নিজেও

কেন জানি তৈরি হতে পারলো না। ওস্তাদজির চিন্তা মাথা থেকে বার বার তাড়াতে চাইলেও স্বপ্নের মধ্যে সে দেখলো জামেলার সাথে সে সঙ্গমোদ্যত কিন্তু সে নিজেই যেন দাড়িআলা জোব্বাধারি ওস্তাদজি। জামেলা খিল খিল করে হেসে তার দাড়ি ধরে টানতেই যাত্রাপালার জালেম বাদশার মতো তার ভুয়া দাড়ি খুলে পড়লো। সকালে উঠে কোরবান দেখলো তার লুঙ্গির মাঝখানে খানিকটা জায়গা ভিজে চটচট করছে।

সন্দেহটা কুকুরের ঘায়ের মাছির মত। লেজ দিয়ে যতই তাড়াতে যায় আবার ঘুরে এসে ঘায়ের উপর বসে। মনে মনে একটা মতলব নিয়ে কোরবান সকালবেলা দোকানে গেল। আজ বেলা সাড়ে বারোটায় সে বাড়ি আসবে। হেঁশেলের পেছনের ঝোঁপের মধ্যে দাঁড়ালে তাকে কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু বাড়ির মধ্যে কী ঘটছে সে সবই দেখতে পাবে। বিশেষকরে জামেলার কেন দুপুরের খাবার পাঠাতে দেরি হচ্ছে তা সে স্বচক্ষে দেখে আসবে।

কোরবান যা সন্দেহ করেছিল তাই-ই। তার মেয়ে আর ওস্তাদজির আরবি পড়ার সম্মিলিত স্বর ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে থেকে। জামেলা একবার হেঁশেলে গিয়ে বসছে একবার জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে আসছে। পনের মিনিটের মধ্যে পাঁচবার জামেলাকে আসা যাওয়া করতে দেখলো কোরবান। না, ওস্তাদজির কোন দোষ নেই। ওস্তাদজি পবিত্র মানুষ। যত কামড় তা হলো ঐ মাগীর। নুরানি চেহারা দেখে মাগী মজেছে। কোরবান নিজের অমসৃণ গালে হাত ঘষতে ঘষতে গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। জামেলা উনুনের সামনে থেকে আর একবার ওঠার উদ্যোগ করতে গিয়েও ধপাস করে পিঁড়ির উপর বসে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। কোরবান রক্তচক্ষু মেলে একহাতে হেঁশেলের খুঁটি ধরে অন্যহাত কোমরে রেখে সরাসরি জামেলার দিকে তাকিয়ে থাকলো। জামেলা থতমত খেয়ে আধাসিদ্ধ ভাতের হাঁড়ির উপর ঢাকনা চাপিয়ে মাড় গলাতে বসে গেল। ওস্তাদজি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোরবান একটি কথাও বললো না। মেয়ে ওড়না মাথায় হেঁশেলের কাছাকাছি পৌঁছালেই কোরবান আঁক করে বউয়ের চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে উঠোনে নামিয়ে এনে মাজার উপর কষে দুই লাথি লাগালো। ছেলে স্কুল থেকে ফিরে বোনের পাশে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে ঘটনাটি দেখলো। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে চাপা গলায় কোরবান বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে বলে গেল-

'খবরদার আমার ভাত আনবি না দোকানে। ওর হাতের রান্না আজ থেকে আমার কাছে হারাম'।

বাপ বেরিয়ে গেলে ছেলেমেয়ে দুটো মার দুহাত ধরে টেনে তুলে ঘরের বারান্দায় নিয়ে গেল। ওদের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না জামেলা। কেবল মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলো। ঠিক এরকম বয়েসেই যে জামেলা এক কঠিন সময় পার করেছিল। তার ওস্তাদজি ছিল তার মেয়ের ওস্তাদজির চেয়েও বয়েসে বড়। ওস্তাদজি একটু একটু করে তার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিল বলে জামেলার বাপ মেয়েকে গণ আরবি শিক্ষা না দিয়ে বাড়িতে মৌলানা রেখে ছহি আরবি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিল। সাতদিনের মাথায় শাড়ি কীভাবে মাথায় তুলে দিয়ে মাথা ঢাকতে হয় তা শেখানোর জন্যে ওস্তাদজি জামেলার বুকে হাত দিয়েছিল। সে পরদিন থেকে আর পড়বে না বলে কান্নাকাটি জুড়ে দিলে ওস্তাদজি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা জামেলার মায়ের উদ্দেশ্যে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলে গিয়েছিল -

'সাতদিন পর আসবো ভাবীজান। মেয়েকে পাকপবিত্র করে কেতাব দিয়ে পাঠাবেন'।

জামেলার মা ঝট করে মেয়ের কোমরে-পাছায় হাত দিয়ে কিছু বুঝতে চাইলো। কই না, মেয়ে তো তার এখনও রজঃস্বলা হয়নি। ওস্তাদজি আন্দাজেই ধারণা করে বসে আছে। কিন্তু সাতদিন ওস্তাদজি আসবে না জেনে জামেলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ও ভাবলো কান্নাকাটি করলেই সাতদিন আরবি পড়া মাফ। সাতদিন পর আবার একা একঘরে ওস্তাদজির কাছে গিয়ে বসতে জামেলার খুব ভয় করছিল। ও বারবার পড়া উল্টাপাল্টা করছিল দেখে ওস্তাদজি ওর আরো কাছ ঘেষে বসে। জামেলা কবুতরের বাচ্চার মতো থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। ওস্তাদজি ফিসফিস করে বলে

'আপনার শরীরে যৌবন এসে গেছে। এখন আপনি বড় হয়ে গেছেন'।

জামেলা অবাক জিজ্ঞাসা নিয়ে ওস্তাদজির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওস্তাদজি হঠাৎ জামেলার শাড়ির নিচ দিয়ে তার শরীরে হাত ঢুকিয়ে দেয়। জামেলা চিৎকার করে কেঁদে উঠতে গেলে ওর মুখ চেপে ধরে ওস্তাদজি বলে -
'একথা কেউ জানলে কোনদিন বেহেস্তে যেতে পারবেন না। কোনদিন আপনার বিবাহ হবে না'।

জামেলা ওর বাপের কাছে বেদম মার খেয়েও ঐ ওস্তাদজির কাছে আর পড়তে রাজি হয়নি। ওস্তাদজিও কী একটা ছুতোয় আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে গ্রামের অনেক মেয়ের সাথে এক ওস্তাদনির কাছে ছিপারা শেষ করে কোরানশরিফ ধরার সময় কোরবান আলীর সাথে মাত্র চৌদ্দ বছর পাঁচমাস বয়েসে জামেলার বিয়ে হয়ে যায়। জামেলা কাউকে তার সেই অপমানের কথা বলতে পারেনি। এমনকি তার প্রাণের সই রুবিনাকেও না। বুকের মধ্যে অজানা পাপবোধ আর মৌলানাদের উপর অসীম ঘৃণা নিয়ে জামেলা এখনও মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে। যেদিন থেকে তার মেয়ের জন্যে মেয়ের বাবা ওস্তাদজি ঠিক করে দিয়েছে সেদিন থেকেই জামেলার সব সুখ হারাম হয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে আর প্রেমময় স্বামী নিয়ে জামেলার তিরতির করে বয়ে যাওয়া ছোট্ট জীবনের নদীটার মাথার উপর মেঘের কালো ছায়া পক্ষ বিস্তার করতে থাকে। ওস্তাদজি ঘরের মধ্যে মেয়েকে নিয়ে পড়তে বসলেই জামেলার সংসারের সব কাজ মাথায় ওঠে। তরকারি কুটকে কুটতে দশবার করে উঠে গিয়ে জালনার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে ভেতরে চোখ রাখে। যদিও এ ক'দিনে মেয়ের ওস্তাদজিকে সে পড়ানো ছাড়া মেয়ের প্রতি কোন বদনজর ফেলতে দেখেনি তবুও ওস্তাদজি চলে না যাওয়া পর্যন্ত জামেলা রান্নার কাজে মন দিতে পারে না। সে নিজে যে অপমান আর লাঞ্ছনা সাথে নিয়ে বড় হয়েছে তারই রক্ত-মাংসের উত্তরাধিকারী, তারই শরীরের অংশ, তার আত্মজাকে সে মরে গেলেও সেই একই অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে দেবে না। কিছুতেই না। তাতে তার সংসার উচ্ছন্নে যায় যাক।

lima_umme@yahoo.com